যুদ্ধ ও জেহাদ

ইয়াজাউল হারব মহানবীর বাণী
যুদ্ধ নয়, অস্ত্র নয়, নহে হানাহানী।
মুসলিম বলে যুদ্ধ নয়, হিন্দুও তাই বলে,
পোপ বলেন, 'নোওয়ার' মোল্লাও সেই দলে!
মহা নবীর বাণী আজি দেখ সত্য হল,
সারা বিশ্ব এক হয়ে 'যুদ্ধ নয়' বল।

আহমদ তৌফিক চৌধুরী

প্রকাশক

ঋতু পত্র প্রকাশনী
১/এ, মহারাজা রোড
ময়মনসিংহ ২২০০
ফোন ঃ ৫৫২৪৮

প্রকাশ কাল
২০০৩ সনের ১১ সেপ্টেম্বর

মূল্য ঃ ২০ টাকা মাত্র

কম্পিউটার কম্পোজ
মোঃ এনামুল হক (মাসুম)
মাল্টিমিডিয়া কমিউনিকেশন্স
২২৭/১ ফকিরাপুল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৪০৮০০

প্রাপ্তিস্থান
রোড-১১, বাসা-৫৪৭
বায়তুল আমান হাউজিং
আদাবর, ঢাকা-১২০৭
ফোন ঃ ৮১২৩৩৬৮, ০১৭১৬১৫৯৩১

উৎসর্গ

যুগে যুগে
বিভিন্ন ধর্মের
মৌলবাদীদের হাতে
নির্যাতিত মজলুম মানুষের স্মরণে

উৎস

বাল্যকালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ দেখেছি। নাগাসাকী হিরোসীমা ধ্বংসের খবর জেনেছি। আগ্নেয়াস্ত্র এবং আনবিক অস্ত্রের ভয়াবহতা অবলোকন করেছি। ১৯৭১ সালে ত্রিশ লক্ষ নর-নারীর হত্যাকান্ড দর্শন করেছি। ইদানিং আফগান, ইরাকের ধ্বংসলীলা দেখেছি। দেশে বিদেশে আগ্নেয়াস্ত্রের ব্যবহার দেখেছি। মন্দির, মসজিদ, গির্জায় বোমা নিক্ষিপ্ত হচ্ছে। টুইন টাওয়ারের পতন ও প্রতিদিন বোমা এবং আগ্নেয়াস্ত্রের মাধ্যমে অগনিত মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে। আনবিক অস্ত্র, জীবানু অস্ত্র অসহায় মানুষের মাথার উপর অহরহ ঝুলছে। মানবতা আজ বোমার হাতে বন্দি। মানুষ এ থেকে মুক্তি চায়। চারদিকে রব উঠেছে, যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই, নোওয়ার। আমার দুর্বল শক্তি দিয়ে আমি যুদ্ধের অবসান চাই। যুদ্ধের উপর আমার এই বইটি অসহায় মানুষদের জন্য রচিত। এটি অস্ত্রের বিরুদ্ধে আমার কলমের জেহাদ।

অস্ত্রের যুদ্ধ বিনাশ হোক,

কলমের জেহাদ অমর হোক।

হিন্দু ধর্মগ্রন্থে যুদ্ধ

হিন্দ বা হিন্দু ধর্মের গ্রন্থগুলিতে যুদ্ধের ব্যপক বর্ণনা রয়েছে। ভারতের ধর্ম ভিত্তিক কাব্য গ্রন্থ মহাভারত এবং রামায়নের মূল বিষয়ই হল যুদ্ধ বিগ্রহ, হানাহানী, মারামারি। মহাভারতের উদ্যোগ পর্ব, ভীষ্ম পর্ব, দ্রোনপর্ব, কর্ণপর্ব, শল্যপর্ব প্রভৃতিতে যুদ্ধের ধ্বংসলীলার কথা বর্ণিত হয়েছে। ভারতের বুকে অতীতে যে রক্ত গঙ্গা প্রবাহিত হয়েছিল তার বর্ণনা ঐ সব পর্বে বিস্তারিত ভাবে বিবৃত হয়েছে। রামায়নের রাম রাবনের যুদ্ধের কাহিনী কবি বাল্মিকীর বিষয় বস্তু। মহাভারতের একটি অংশের নাম গীতা। গীতা অর্থ গীত বা গান। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধকে কেন্দ্র করে এই গান রচিত হয়েছিল। কৃষ্ণ (কাল) অর্জুন (সাদা) প্রতীকের মাধ্যমে কথোপকথন এই গানের বিষয় বস্তু। গীতার মতে যুদ্ধক্ষেত্র কুরুক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্ররূপে স্বীকৃত। ধর্মক্ষেত্রে কুরুক্ষেত্রে সমবেত যুযুৎসবঃ । অর্জুন শুভ্র বা কোমল অন্তরের মানুষ। তিনি যুদ্ধ, হত্যা, রক্তপাত পছন্দ করতেন না। তিনি ছিলেন যুদ্ধ বিরোধী শান্তি প্রিয় সাদা অন্তরের মানুষ। অপর দিকে কৃষ্ণরূপে যাকে চিত্রিত করা হয়েছে তিনি ছিলেন যুদ্ধের পক্ষে। হত্যা এবং ধ্বংস তার কাছে অতি সাধারণ বিষয়। অর্জুন যখন বললেন, আমি যুদ্ধ করব না তখন কৃষ্ণ বললেন হে পার্থ কাতর হইওনা। এই পৌরুষ হীনতা তোমাকে শোভা পায়না (২/৩)। প্রকৃত জ্ঞানী ব্যক্তিরা কি মৃত, কি জীবিত কাহারও জন্য শোক করেন না (২/১১)। গতানৃগতা সৃংশ্চনানু শোচন্তি পণ্ডিতাঃ। অতএব তুমি যুদ্ধ কর (২/১৮) যুধ্যস্ব ভারত। ধর্ম যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের পক্ষে শ্রেয় আর কিছু নেই। ধর্মাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োহনাৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে (২/৩১) হত বা প্রাপ্স্যাসি স্বর্গ জিত্বাবা ভোক্ষ্য সে মহীম (২/৩৭) এই যুদ্ধে হত হলে স্বর্গলাভ আর জয়ী হলে পৃথিবী লাভ। এত সব লোভনীয় বক্তব্যের পরও অর্জুন অস্ত্র ত্যাগ করে বসে আছেন। তিনি কোন মতেই যুদ্ধ করবেন না। অপর দিকে কৃষ্ণ বার বার বলে যাচ্ছেন, নিরাশী নির্মমোভূত্বা যুধ্যস্ব বিগত জ্বরঃ (৩/৩০) কামনা ও মমতা শূণ্য হয়ে শোক ত্যাগ করে তুমি যুদ্ধ কর।

গীতা কোন আবতীর্ণ গ্রন্থ নয়। কুরুক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে অবতার কৃষ্ণ এহেন দীর্ঘ বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন বলেও গুনীজন বিশ্বাস করেন না। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, গীতা গ্রন্থ খানী ভগবত প্রণীত নহে, অন্যব্যক্তি ইহার প্রনেতা (রচনাবলী, ৬৯৩ পৃঃ) তিনি আরো বলেছেন, যুদ্ধ ক্ষেত্রে উভয় সেনার সম্মুখে রথ স্থাপিত করিয়া কৃষ্ণার্জুনে যথার্থ এইরূপ কথোপকথন যে হইয়াছিল তাহা বিশেষ সন্দেহ (রচনাবলী)

অনেকের মতে গীতা শঙ্করাচার্য প্রণীত। রচনার পর এটিকে মহাভারতে ঢুকিয়ে দেয়া হয় (ভারতে বিবেকানন্দ, ৪২৪ পৃঃ) গীতা মহাভারতের অংশ কিনা সে বিষয়েও পন্ডিতদের সন্দেহ (শ্রী রাধার ক্রম বিকাশ, দর্শনে ও সাহিত্যে, ৫৯ পৃঃ)। মহাভারত এক হাতের রচনা নয়। এক সময়ের লেখাও নয় (বঙ্কিম রচনাবলী, ৯০৩ পৃঃ)। ভারতে কৃষ্ণ নামে বহু লোকের জন্ম হয়েছে। উইনটারনিস বলেছেন, পান্ডব দিগের সখা ও পরামর্শ দাতা কৃষ্ণ, ভগবত গীতার তত্ত্ব সিদ্ধান্তের প্রাচারক কৃষ্ণ, যুবসভার বীর ও অসুর নিসুদন.কৃষ্ণ। গোপী দিকের প্রিয়তম ও বল্লভকৃষ্ণ এবং পরিশেষে দেব শ্রেষ্ঠ বিষ্ণুর অবতার কৃষ্ণ যে এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতে পারেন তাহা বিশ্বাস করা কঠিন। ইহা অধিকতর সম্ভব যে, দুই বা কতিপয় কিম্বদন্তী পরম্পরাগত কৃষ্ণ ছিলেন, তাহারা পরবর্তীকালে একই দেবতারূপে সংমিশ্রিত হইয়াছিল (A History of Indian Literature, Vol-1, Page 456) ডঃ প্রফুল্ল ঘোষ বলেছেন, মহভারতের কৃষ্ণ, ছান্দোগ্যো উপনিষদের কৃষ্ণ, শ্রীমত ভগবতের কৃষ্ণ, আর শ্রী রাধার মানভঞ্জনকারী কৃষ্ণ এক কিনা একথা জোর করে বলা শক্ত (প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার ইতিহাস, ১৩ পৃঃ)।

বৌদ্ধ জাতিকায় কৃষ্ণকে মহা অত্যাচারী উশৃঙ্খল রূপে চিত্রিত করা হয়েছে (জাতক, ঈশান চন্দ্র ঘোষ অনুদিত ৪র্থ খন্ড)। কৃষ্ণ নামে এক অসুরেরও সন্ধান পাওয়া যায় (নীতি মঞ্জুরী, ১৩২ (শ্লাক)। এই সব বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে কৃষ্ণ একজন নয় বহু। অবতার কৃষ্ণ এবং অন্যান্য কৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন হলেও তাদের জীবন চরিত্র একত্রে মিলিয়ে ফেলা হয়েছে। মহাভারত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তি রচনা করেছেন। গীতা একটি গান যা পরবর্তীকালে মহাভারতে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছে। গীতার কৃষ্ণ অবতার কৃষ্ণ নহেন। গীতায় সাদা (অর্জুন) এবং কৃষ্ণ (অন্ধকার, কাল) দুটি প্রতীক ব্যবহার করা হয়েছে। কৃষ্ণ প্রতীক যুদ্ধ, ধ্বংস এবং হত্যার পক্ষে, নির্মম এবং নিষ্ঠুর, ক্ষমাহীন। অপর দিকে সাদা বা সন্ধির প্রতীক (অর্জুন) কোমল হৃদয়ের অধিকারী, দয়ালু, রক্ত পাতের বিরোধী। গীতার কৃষ্ণ অবতার কৃষ্ণ নহেন। অবতার পুরুষ কখনও নির্দয় নিষ্ঠুর হতে পারেন না। অবতার পুরুষেরা মানুষের জন্য কল্যাণ এবং প্রেমের বাণী নিয়ে আসেন। তাঁরা ধ্বংস চান না তাঁরা চান শান্তি, প্রেম, প্রীতি ও দয়া। তাঁরা নিজেরা অত্যাচার সহ্য করেন, দেশ ত্যাগ করেন। তাঁরা অস্ত্র নিয়ে অবতীর্ণ হননা। তাঁরা অবতীর্ণ হন প্রেমের বাণী নিয়ে। ঐশী প্রেমের বাঁশী নিয়ে। তাঁরা দুর্বল এবং দুঃখী জনের সখা। গীতার অর্জুনের চরিত্রটি অবতার পুরুষের চরিত্র। আসলে গীতার রচয়িতা দুটি প্রতীক (কাল এবং শুভ্র) ব্যবহার করে যুদ্ধের পক্ষ এবং বিপক্ষের মনোভাব দুটি বিবৃত করেছেন। পরবর্তী কালে লোকেরা গীতাকারের কৃষ্ণকে অবতার কৃষ্ণ বানিয়ে ফেলেছে। মহাভারতের অন্যত্র আছে, ধর্ম ব্যুচ্ছিতি মিচ্ছন্তো যেহ ধর্মস্য প্রবর্তকাঃ। হস্তব্যস্তে দুরাত্মানো দেবৈদৈত্যা ইতল্বনাঃ)।

অর্থাৎ যারা ধর্মের উচ্ছেদ কামনা করে, অধর্মের প্রবর্তন করে সেই সব দুরাত্মাকে ধ্বংস করা একান্ত কর্তব্য। যেমন ভাবে দেবগণ দৈত্যগণকে বধ করেছিলেন (১২/৩৩/৩০)। হিন্দু ধর্ম গ্রন্থে দেব এবং দৈত্যদের যুদ্ধের বিশদ বর্ণনা আছে। দেব পন্থী এবং অসুর পন্থীদের রক্তারক্তির বিবরণ দেখতে পাওয়া যায়। দেব এবং অসুর দুই ভাই, তারা নিজেদের প্রাধান্য বিস্তার করবার জন্য (ধর্মের জন্য নয়) যুদ্ধ করেছিল। ভারত এবং পারশ্যের মধ্যে এই যুদ্ধ সংগঠিত হয়েছিল। ভারতের নেতা দেব এবং পারস্যের নেতা আহুর বা অসুর। কুরুপাণ্ডরের যুদ্ধও ধর্ম নিয়ে নয়। রামচন্দ্রের জন্ম ভূমি অযোদ্ধার অর্থ হল, যেখানে কোন যোদ্ধা নেই, যুদ্ধ নেই। কিন্তু আজ সেখানেও বাবরি মসজিদ আর রাম জন্মভূমি নিয়ে রক্তপাত। অহিংসার বাণী বাহক বৌদ্ধদের মূখে আজ বুদ্ধ নয়, যুদ্ধং আর যুদ্ধ। এ থেকে মুক্তি লাভ হবে কল্কি বা মৈত্রয়ের দ্বারা। কল্কির অর্থ কলহনাশকারী আর মৈত্রের অর্থ সকল জীবের মিত্র যিনি। ব্রাহ্মণ অর্থও তাই। জন্মগত ব্রাহ্মণ নয় কর্মগত ব্রাহ্মণ যারা তারাই প্রকৃত ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ শব্দের ব্যাখ্যা হল, কুর্যাদন্যন্ন কুর্যান্মৈত্রো ব্রাহ্মণ উচ্চতে (মনু, ২/৮৭) সকলের মিত্র যিনি তিনিই ব্রাহ্মণ। কল্কির আগমন কালে, যুগান্তে হতভুক চাপি সর্বতঃ প্রজ্জলিষ্যতি (মহাভারত, বন পর্ব, ১৯০/৮২) অর্থাৎ তখন সমগ্র পৃথিবীতে যুদ্ধের আগুন জ্বলে উঠবে। সর্বত্র আগ্নেয়াস্ত্রের দ্বারা যুদ্ধ হবে। আরবী ভাষায়ও যুদ্ধকে নার বা আগুন বলা হয়েছে। ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা হল, সর্বথা যতমানা নাম যুদ্ধমভিকাঙ্খতাম। সাত্বে প্রতিহতে যুদ্ধং প্রসিদ্ধংনা পরাক্রামঃ। অর্থাৎ যুদ্ধের আকাঙ্খা নাকরে শান্তির জন্য সর্ব প্রকার প্রচেষ্টা চালিয়েও যারা ব্যর্থ হয় তাদের জন্য যুদ্ধ করা অবশ্য কর্তব্য (মহাভা, ৫/৭২/৮৯)। শান্তি! শান্তি!! শান্তি!!!

বাইবেলের যুদ্ধ নীতি

তৌরাত, কিতোবিম, নবীঈম এবং ইঞ্জিল পুস্তকের মিলিত নাম বাইবেল। বাইবেল ইহুদী এবং খ্রীষ্টানদের ধর্মপুস্তক। খ্রীষ্টান ধর্ম ইহুদী ধর্মেরই একটি শাখা। যীশু মূলত ইহুদী ছিলেন। তিনি কোন নূতন ধর্ম ব্যবস্থা নিয়ে আবির্ভূত হননি। যীশু বলেন, Do not think that I am come to destroy the law, or the prophets, Iam not come to destroy, but to fulfil (Matt. 5 : 17) তিনি মূসার বিধান মেনে চলার নির্দেশ দিয়ে গেছেন (মথি, ৮ ঃ ৪)।

বাইবেলের যুদ্ধ নীতি অত্যন্ত কঠোর এবং নিষ্ঠুর। বলা হয়েছে, তোমরা যুদ্ধার্থে নিকটবর্তী হইলে যাজক আসিয়া লোকদের কাছে কথা কহিবে, তাহাদিগকে বলিবে, হে ইস্রায়েল, শুন, তোমরা অদ্য তোমাদের শত্রুদের সহিত যুদ্ধ করিতে নিকটে

যাইতেছ, তোমাদের হৃদয় দুর্বল না হউক; ভয় করিও না, কম্পমান হইও না, বা উহাদের হইতে মহাভয়ে ভীত হইও না। কেননা তোমাদের ঈশ্বর সদা প্রভুই (যেহোবা) তোমাদের নিস্তারার্থে তোমাদের পক্ষে তোমাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে তোমাদের সঙ্গে সঙ্গে যাইতেছেন (দ্বিতীয় বিবরণ, ২০ ঃ ৩, ৪) এর পর বলা হয়েছে, পরে তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভু (আদুনাই) তাহা তোমার হস্তগত করিলে তুমি তাহার সমস্ত পুরুষকে খড়গ ধারে আঘাত করিবে, কিন্তু স্ত্রী লোক, বালক বালিকা ও পশুগণ প্রভৃতি নগরের সর্বস্ব, সমস্ত লুট দ্রব্য আপনার জন্য লুট স্বরূপে গ্রহন করিবে (১৩, ১৪) অন্যত্র আছে, নিঃশেষে বিনষ্ট কর, তাহার প্রতি দয়া করিওনা (১ শামুয়েল, ১৫ ঃ ৩)। এই আইন এত নির্মম এবং নিষ্ঠুর যে, কোন শ্বাস গ্রহণকারীকে জীবিত রাখার হুকুম নেই (দ্বিঃবিঃ ২০ ঃ ১৬) ১ রাজাবলি, ১৫ ঃ২৯ পদেও একথা বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাহাদের প্রতি দয়া করিবে না (দ্বিঃবিঃ ৭ঃ৩)। ইহুদী ধর্মে সকল বালক এবং বিবাহিতা স্ত্রী লোককে হত্যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তবে অবিবাহিতা দেরকে নিজেদের শয্যা সঙ্গী হিসাবে জীবিত রাখার অনুমতি দেয়া হয়েছে (গণনা, ৩১ঃ১৭, ১৮)।

বাইবেলের এই নিষ্ঠুর নিয়ম নীতি আজো ইস্রায়েল জাতি অক্ষরে অক্ষরে পালন করে চলেছে। ইহুদীরা ক্ষমাহীন, নির্দয়, নিষ্ঠুর হয়েছে বাইবেলের এই সব নির্দেশের কারণেই। ইহুদীদের মধ্যে যে যত পাষান সে তত ধার্মিক। তারা দাঁতের পরিবর্তে দাঁত। চোখের পরিবর্তে চোখ গ্রহণ করার পক্ষে। তারা দয়া ও সন্ধির বিপক্ষে।

খ্রীষ্টানরা যদিও প্রেমের কথা বলে তবে কার্যত তারাও ইহুদীদের মত। দুনিয়ার যত প্রকার মারনাস্ত্র তার সবগুলিই ইহুদী ও খ্রীষ্টানদের দ্বারা নির্মিত। আনবিক বোমার অভিশাপ ইহুদী খ্রীষ্টানরাই আমদানী করেছে। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইহুদী খ্রীষ্টানদেরই অবদান। হিটলার এবং বুশ ধর্মত খ্রীষ্টানই। যীশু বলেছিলেন, Do not think that I came to send peace upon earth. I came not to send peace, but the sword (Matt, 10:34)। লুক পুস্তকে বলা হয়েছে, Think Ye, that I am come to give peace on cesth? I tell you, no; but separation (৫১ পদ)। যদি একথা যীশু বলে থাকেন তাহলে খ্রীষ্টানদের মুখে শান্তির কথা শোভা পায় না। আমাদের বিশ্বাস যীশু খ্রীষ্ট এ হেন কথা বলতে পারেন না। যীশু প্রেম প্রীতি, ক্ষমা এবং ভালবাসার অমৃত বাণী নিয়ে ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি যদিও রহমতুল্লিল আলামীন ছিলেন না তবে অবশ্যই রহমতে আলম ছিলেন। প্রত্যেক নবীই তাঁর নিজ যুগের কল্যাণ স্বরূপ ছিলেন। তাঁরা অত্যাচারিত হয়েও কারো উপর অত্যাচার করেন নি।

যীশু গত হয়েছেন আজ থেকে দুই হাজার বৎসর আগে। তিনি যাবার আগে বলে গেছেন যে শেষ যুগে তাঁর আর একটি আবির্ভাব হবে। তখন, You shall hear of wars and rumours of wars ... For nation shall rise against nation and kingdom against kingdom (Matt, 24: 6, 7) ঐ যুগে ভয়ানক যুদ্ধ হবে, জাতির বিরুদ্ধে জাতি এবং রাজ্যের বিরুদ্ধে রাজ্য যুদ্ধে লিপ্ত হবে। তখন মসিহ্ শান্তির বানী নিয়ে জগতে আবির্ভূত হবেন। যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটবে। অনেকে মনে করেন, স্বয়ং যীশু আকাশ থেকে অবতীর্ণ হবেন। আবার কেউ কেউ দলীল প্রমাণ দিয়ে বলে থাকেন যে, দুই হাজার বৎসর পূর্বের মসিহ নন বরং মসিহের গুনে গুনান্বিত হয়ে অপর এক ব্যক্তি শেষ যুগের মসিহ রূপে আবির্ভূত হবেন। তিনি পৃথিবীতে শান্তি স্থাপন করবেন। তিনি খড়গ দিতে নয় শান্তি দিতে আবির্ভূত হবেন। He will come with peace not with sword. Peace! Peace !! শলোম!!!

ইসলামের যুদ্ধ নীতি

ইসলামের এক অর্থ শান্তি। আল্লাহর একটি সিফত হল, সালাম। ইসলামের আহবান, উদউইলাদারিস সালাম অর্থাৎ শান্তির দিকে আহ্বান কর। মুসলমানদের মুখে থাকবে আস্সালাম। সবাইকে সে শান্তির আহ্বান জানাবে। জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে পরিচিত অপরিচিত সবাইকে বলবে, আসসালামু আলাইকুম! ইসলামের কেন্দ্র কাবা গৃহ ওয়া মাসাবাতালিন নাসে আমনা। মানব জাতির জন্য শান্তি কেন্দ্র, দারুল আমান। ওখানে সবাই নিরাপদ।

ইসলাম যুদ্ধকে ঘৃণা করে। মহানবী (সাঃ) দাবী করার পর মক্কাবাসী তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন করেছে। তাঁকে বয়কট করেছে। চাবুকদিয়ে পিটিয়েছে, তাঁর পথে কাটাঁ দিয়েছে, তাঁকে পাথর মেরে ক্ষত বিক্ষত করেছে। গলায় ফাঁস লাগিয়ে হত্যা করার চেষ্টা করেছে। তাঁর সঙ্গীদেরকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। বিপরীত মুখী দুটি উটের পায়ের সঙ্গে সাহাবীর দুটি পা বেঁধে দেহটিকে দুই টুকরা করে ফেলা হয়েছে। এক একটি করে হাত পা কাটা হয়েছে। গর্ভবতী নারীর নিম্নাঙ্গে বর্শার আঘাত করে গর্ভপাত ঘটিয়েছে। কোন কোন সাহাবীকে বুকে পাথর চাপা দিয়ে উত্তপ্ত মরুভুমিতে সারা দিন সূর্যমুখী করে ফেলে রাখা হয়েছে। খাদ্যের অভাবে সাহাবীরা ঘাস খেয়ে জীবন ধারণ করেছেন। মাতৃভূমি থেকে ধর্মের জন্য সর্বহারা রূপে বহিস্কার করা হয়েছে। তবুও মহানবী (সাঃ) যুদ্ধ করেননি। কাউকে যুদ্ধের অনুমতি দেননি। সাহাবীরা সহ্য করতে না পেরে লড়ে মরার জন্য অনুমতি চেয়েছেন। কিন্তু দয়ার সাগর নবীজি (সাঃ) বলেছেন, ইন্নি উমিরতু বিল আফু ফালা তুকাতেলু। না আমাকে

এদেরকে ক্ষমা করতে বলা হয়েছে। যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়নি (নেসায়ী) শেষ পর্যন্ত মক্কায় থাকতে না পেরে নবী করিম (সাঃ) সব কিছু ফেলে খালি হাতে মদিনায় হিজরত করেন। কিন্তু তাতেও যুদ্ধকে এড়াতে পারলেন না। মক্কাবাসীরা দলবল নিয়ে মদিনার দিকে অগ্রসর হল। তারা মদিনা আক্রমন করে মুসলমান নারী পুরুষকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। নব ধর্ম ইসলামকে পৃথিবীর বুক থেকে উচ্ছেদ করবে। তখন আল্লাতালা মোহাম্মদ (সাঃ) কে ওহী করলেন, উজিনাল্লাজিনা ইউকাতালুনা বি আন্নাহুম জুলিমু ওয়া ইন্নাল্লাহা আলা নাসরিহিম লাকাদির (সূরা আল-হাজ্ব) অর্থাৎ- এখন ঐ সব মজলুম মুসলমানদেরকে যাদের বিরুদ্ধে শক্ররা অহেতুক যুদ্ধ করতে এসেছে অনুমতি দেয়া গেল। তারা যেন দুশমনের মোকাবেলা করে। আল্লাতালা তাদেরকে সাহায্য করবেন। যুদ্ধকে এড়িয়ে যারা হিজরত করে চলে এসেছিলন তাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলার জন্য যেসব কাফের সৈন্য কয়েক শত মাইল এগিয়ে এসে মদিনা আক্রমন করতে অগ্রসর হল। তখন আল্লার নির্দেশে মহানবী (সাঃ) তিনশত তের জন মুসলমান নিয়ে (তাদের মধ্যে বৃদ্ধ এবং নাবালকও ছিল) অস্ত্রহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় বদর পর্যন্ত এগিয়ে এসে প্রতিরোধ করলেন। আল্লার দরবারে মহানবী (সাঃ) দোয়া করলেন, হে আল্লাহ এই মুষ্টিমেয় মুসলমানকে ধ্বংস হতে দিওনা, তুমি রক্ষা কর। এরা ধ্বংস হয়ে গেলে তোমার নাম নেবার জন্য আর কেউ অবশিষ্ট থাকবে না। আল্লাহ তালার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী এই দূর্বল মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করেছিলেন। বড় বড় কুরেশ নেতা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছিলেন। মহানবী (সাঃ) স্বয়ং শক্র সৈন্যদের লাশ দাঁড়িয়ে থেকে কবরস্থ করেছিলেন। কোন লাশের অশ্রদ্ধা বা অঙ্গচ্ছেদও করতে দেননি। বন্দিদের বাঁধন ঠিলে করার জন্য নির্দেশ দিয়ে ছিলেন। ইসলাম বলে কাতেলু ফি সাবি লিল্লাহিললাজিনা ইউকাতে লুনাকুম ওলা তাতাদু ইন্নাল্লাহা লাইউহেববুল মুতাদিন (সুরা বাকারা) অর্থাৎ- খোদার রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই কর যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, আর কোন প্রকার বাড়া বাড়ি কর না কেননা আল্লাহ তালা সীমা লংঘনকারীদের পছন্দ করেন না। শর্ত সাপেক্ষে একান্ত বাধ্য হয়ে যুদ্ধ করারতো অনুমতি আছে, তবে তা সীমা লঙ্ঘন করার অনুমতি নেই। যারা যুদ্ধে অংশ গ্রহন করেনি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা নিষেধ। ইসলামে যুদ্ধ শুধু আত্মরক্ষার্থে আক্রান্ত হলে জান-মাল এবং ইজ্জত রক্ষার্থে। যারা যুদ্ধ করে না, অস্ত্র ধারণ করেনা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ নিষেধ। ওয়াইন জানাহু লিস সালমে কাজ না লাহুম ওয়া তাওক্কাল আলাল্লাহ (সুরা আনফাল) অর্থাৎ- যদি শক্র পক্ষ সন্ধি করতে চায় তাহলে তোমরাও সন্ধি কর এবং আল্লার উপর ভরসা কর। যুদ্ধে বিজয়ী হওয়া বড় কথা নয়, সন্ধিই উত্তম। জয় নিশ্চিত জেনেও সন্ধি করবে যদি শক্র পক্ষ সন্ধির জন্য আবেদন জানায়। ফাইম্মা মান্নান বাদু ওয়া ইম্মা ফিদায়ান হাত্তা তাজ আল হারবু আওজাহাদা (সুরা মোহাম্মদ) অর্থাৎ- যুদ্ধে যারা বন্দি হবে তাদেরকে কৃপা

করে ছেড়ে দাও। অথবা সাধ্য মোতাবেক ফিদিয়া বা বিনিময় গ্রহণ করে তাদেরকে মুক্ত করে দাও। যাতে যুদ্ধ শেষ হয়ে যায়। যে সব যুদ্ধবন্দি অর্থ দিতে পারেনা তারা অন্য কোন কাজের মাধ্যমে মুক্তি পন আদায় করতে পারবে। ইসলাম সন্ধিকে পছন্দ করে আসসুলহে খায়রুন। হুদায়বিয়ার সন্ধি ক্ষমতা থাকা সত্তেও মহানবী (সাঃ) অসম সর্তে শান্তির জন্য সম্পাদন করেছিলেন। তিনি নিজ হাতে কুরেশদের কাছে আপত্তিকর বাক্য "রসুল আল্লাহ" কেটে দিয়ে ছিলেন। মহানবী (সাঃ) কখনও কলম ব্যবহার করেননি। এই একবার জীবনে কলম ধরে ছিলেন শান্তির জন্য। শান্তির জন্য রসুল আল্লাহ শব্দটি পর্যন্ত কেটে দিয়েছিলেন। ফল হয়েছে এই, শত যুদ্ধেও যে বিজয় আশা করা যায়না এই সন্ধিতে বিনা যুদ্ধে সেই বিজয় লাভ সম্ভব হল। মক্কা বিজয় তরান্বিত হল বিনা রক্তপাতে। মক্কা বিজয়ের একটি ঝলকঃ দশ সহস্র সাহাবী নিয়ে মহানবী বিশ্ব নবী মক্কায় প্রবেশ করতে যাচ্ছেন। সাদ বিন ওবায়দা (রাঃ) মুসলিম বাহিনীর অধিনায়ক, আট বৎসর আগে অত্যাচার অবিচারে অতিষ্ঠ হয়ে নির্যাতন নিপীড়নে টিকতে না পেরে মুসলমানরা মক্কা ত্যাগ করেছিলেন। আজ তাঁরা বিজয়ীর বেশে জন্মভূমিতে ফিরে এসেছেন। আনন্দে আর আবেগে আজ তাঁরা আল্লাহর দরবারে শ্রদ্ধায় নত, হৃদয়ের সমস্ত আবেগ দিয়ে তাঁরা সেজদা প্রনত হচ্ছেন বিশ্ব প্রভূর দরবারে। অত্যাচারী মক্কাবাসীরা নিজেদের অপকর্ম স্মরণ করে থর থর করে কাঁপছে। তাদের সকল আশা ভরসা ভেঁঙ্গে চুর্ন বিচুর্ন হয়ে গেছে। পলায়নের কোন স্থান নেই। পাথরের দেব দেবীগুলির মত আজ তারা নিশ্চল। সেনাপতি সাদ (রাঃ) আনন্দে গান ধরেছেন-

আল-ইয়াওমু ইয়াওমু মুলহিমাতিন, আল ইয়াওমা তাছতাহিল্লুল কাবাতি।

অর্থাৎ- আজ প্রতিশোধ গ্রহনের দিন, আজ কাবা প্রাঙ্গনেও যুদ্ধ বৈধ। দয়ার সাগর রহমতুল্লিল আলামিন একথা শুনা মাত্র বল্লেন না, না, বরং বল, আল ইয়াওমু ইয়াওমু মার হামাতিন। আজ ক্ষমা প্রদর্শনের দিন। যারা মুসলমানদেরকে হত্যা করেছিল তাদের নেতা ইয়াকরামাবিন আবু জাহল, হামজার (রাঃ) হত্যাকারী ওয়াশী, হামজার (রাঃ) কলিজা চর্বনকারী হেন্দা, মহানবীর (সাঃ) কন্যার ঘাতক হাব্বাব, বিলালের (রাঃ) উপর অকথ্য অত্যাচারকারীরা রয়েছে আজ মক্কায়। নবী করিম (সাঃ) ঘোষণা করলেন, লা তাছরীব আলাইকুমুল ইয়াওমা। আজ কোন প্রতিশোধ নয়। শুধু ক্ষমা আর ক্ষমা। এক বৃদ্ধা থর থর করে কাঁপছে। নুর নবী (সাঃ) তাকে বল্লেন, কাঁপছ কেন মা? আমিতো তোমারই মত এক কুরেশ রমনীর সন্তান। আমাকে ভয় করার কি আছে ? কি অপূর্ব দৃশ্য! এর নজির কি আর কোথাও আছে ? প্রায় দশ বৎসর পূর্বের এক ঘটনা। এক বুড়ি তার পুটুলী নিয়ে মক্কা থেকে অন্যত্র চলে যাচ্ছে। মহানবীর (সাঃ) সঙ্গে রাস্তায় দেখা। নবীজি বল্লেন, কোথায় যাচ্ছ ? বুড়ি বল্ল, বাবা মক্কায়

মোহাম্মদ নামক এক ব্যক্তি মানুষের ইমান নষ্ট করে দিচ্ছে। আমি এই ভয়ে ইমান নিয়ে মক্কা থেকে পালিয়ে যাচ্ছি। বুড়ি নবীজিকে চিনতে পারেনি। নবী করীম (সাঃ) বললেন, আমি তোমার পুটুলীটি তোমার গন্তব্য স্থানে পৌছে দিচ্ছি। গন্তব্য স্থানে পৌছে নবী আকরাম (সাঃ) যখন ফিরে আসছেন তখন ঐ বৃদ্ধা বল্ল, বাবা তুমি খুব ভাল লোক, সাবধান! মোহাম্মদের ধারে কাছেও যাবে না। মহানবী (সাঃ) বল্লেন, আমি সেই মোহাম্মদ! আরো আগের কথা, এক বৃদ্ধা মহানবীর (সাঃ) রাস্তায় কাঁটা দিত, একবার দেখা গেল রাস্তায় কাঁটা নেই। মহানবী (সাঃ) বুড়ির কথা জিজ্ঞেস করলেন। কে এক জন বল্ল যে, বুড়ি অসুস্থ, তাই কাঁটা দিতে পারছেনা। নবীজি (সাঃ) তাকে দেখতে গেলেন। বুড়িকে সহানুভূতি জানালেন। একটি লাশ যাচ্ছিল রাস্তা দিয়ে। মহানবী (সাঃ) সম্মানার্থে উঠে দাঁড়ালেন। সাহাবীরা বল্লেন, এটি একটি ইহুদির লাশ। মহানবী (সাঃ) বল্লেন, এর মধ্যে কি কোন কালে আত্মাছিল না? একবার এক শত্রু নবী করীমকে (সাঃ) একাকী শায়িত অবস্থায় পেয়ে তরবারী উঠিয়ে তাঁকে হত্যা করতে চাইল এবং বল্ল, এখন কে তোমাকে রক্ষা করবে? নবীজি (সাঃ) বল্লেন, আল্লাহ! এই উচ্চারনের মধ্যে এত প্রভাব ছিল যে তরবারীটি তার হাত থেকে পড়েগেল। নবী সম্রাট (সাঃ) তরবারীটি হাতে নিয়ে বল্লেন, এখন কে তোমাকে বাঁচাবে? লোকটি বলল, তুমি, তুমিই আমাকে প্রান ভিক্ষা দিতে পার। নবী করীম (সাঃ) বলেলন, না তোমাকেও সেই আল্লাহ রক্ষা করবেন যে আল্লাহ আমাকে রক্ষা করেছেন। এই ছিল মহানবীর (সাঃ) আদর্শ। জনৈক খ্রীষ্টান লেখক বলেছেন, মুসলমানরা তাদের বিজয় অভিযানে সহনশীলতার নমুনা দেখিয়ে অনেক খ্রীষ্ট্রান জাতিকেই লজ্জিত করে দিয়েছে- (The Struggle for Power in Muslim Asia, p-48).

মহানবী বলেছেন, তোমরা শত্রুর মোকাবেলা করার ইচ্ছা পোষন করনা, আল্লাহর কাছে শান্তি কামনা কর । কিন্তু অনিচ্ছা সত্তেও আত্ম রক্ষার জন্য যদি যুদ্ধ করতেই হয় তাহলে বীরের মত মোকাবেলা কর (বোখারী মুসলিম-আবুদাউদ) বদরের যুদ্ধের পর মহানবী (সাঃ) ঠিক করলেন যে, এই মুষ্টিময় মুসলমানদেরকে নিয়ে মদিনার বাইরে গিয়ে আর যুদ্ধ করবেন না। মদিনায় থেকে শুধু মদিনাকেই রক্ষা করবেন। কিন্তু কতিপয় উৎসাহী সাহাবীর জন্য নবী করীম (সাঃ)-কে মদিনার বাইরে ওহুদের পাদদেশে যেতে হল শত্রুর মোকাবেলা করার জন্য। খন্দকের যুদ্ধ প্রকৃত পক্ষে কোন যুদ্ধ ছিলনা। এটি ছিল প্রতিরোধ মাত্র। পরবর্তী কালে মদিনার বাইরে গিয়ে বিভিন্ন কাবিলার মোকাবেলা করতে হয়েছে বাধ্য হয়ে। ঐ সব কাবিলা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমনের পরিকল্পনা করেছিল। তাই অঙ্কুরেই সেই সব চক্রান্তের মোকাবেলা করতে হয়েছিল। যুদ্ধে যে সব বন্দি হস্তগত হয়েছিল তাদেরকে মুক্তিদান করা অত্যান্ত পূণ্য কর্ম বলে নবীজি (সাঃ) ঘোষনা করলেন। ফলে হাজার হাজার যুদ্ধ বন্দি বিনিময় মূল্য

ছাড়াই মুক্তি পেল। এখানে উল্লেখ্য যে, যেসব মুসলমান কাফেরদের হাতে বন্দি হয়েছেন তাদের মুক্তির জন্য এহেন কোন ব্যবস্থা ছিলনা।

যুদ্ধ ও জেহাদ

যুদ্ধ কে আরবীতে বলে কিতাল। যুদ্ধের নাম জেহাদ নয়। জেহাদ জাহদ শব্দ থেকে। এর অর্থ পরিপূর্ণ রূপে চেষ্টা প্রচেষ্টা করা (তাজুল উরুস) নিজের প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা সব চাইতে বড় জেহাদ, জেহাদে আকবর (মেশকাত) মহানবী (সাঃ) বলেছেন নিজেদের নফসের বিরুদ্ধে যে জেহাদ করে সেই বড় পাহলোয়ান। শয়তান নফসে আম্মারা বা কুকর্মের বিরুদ্ধে লড়াই করা হল জেহাদে আকবর। ওয়া জাহেদ হুমবিহি জেহাদা (সুরা-ফুরকান) অর্থাৎ- কোরআন দিয়ে যুক্তি প্রমান দিয়ে জেহাদ করাকে বলে জেহাদে কবীর। খোদার নির্দেশিত পথে সর্ব প্রকার চেষ্টা প্রচেষ্টার নামই হল, জেহাদ ফি-সাবিলিল্লাহ। কোরআন বলে, ওয়াল্লাজিনা জাহাদু ফিনালানাহ দিয়ান্নাহুম ছুবুলানা। কোরআনে আছে, তুজাহেদুনা ফি সাবিলিল্লাহি বি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুসিকুম। অর্থাৎ- আল্লাহর পথে সম্পদ এবং জীবন দ্বারা সংগ্রাম করাকে উৎকৃষ্ট জেহাদ বলা হয়েছে। প্রথমেই বলা হয়েছে মাল বা সম্পদ দিয়ে জেহাদ করা। তারপর জীবন দিয়ে জেহাদ করার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর রাস্তায় ধনের জেহাদ হল ইসলাম প্রচারে চাঁদা দেয়া। ধন সম্পদ ব্যয় করে জনহিতকর কাজ করাও জেহাদ। মানুষের কল্যাণে মানুষের সাহায্যে এগিয়ে আসার নামও জেহাদ। জীবন বা নফস দিয়ে জেহাদ করার অর্থ হল সমস্ত শক্তি যার যা আছে তা দিয়ে সংগ্রাম করা। মৌখিক প্রচার লেখনির মাধ্যমে প্রচার গবেষণা সাধনা করাও নফসের জেহাদ, আল্লাহর জন্য জীবন দান করার নামও জেহাদ। ইসলাম ধর্মের জন্য বাধ্য হয়ে আত্মরক্ষা মূলক যুদ্ধকেও একটি ক্ষুদ্র জেহাদ বলেছে। তবুক যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে নবী করীম (সাঃ) বলেছিলেন, ওয়াজায়াল নাল জেহাদীল আসগারে ইলাল জেহাদিল আকবারে (কাশশাফ) অর্থাৎ- আমরা এখন ছোট জেহাদ (আসগার) থেকে বড় জেহাদের (আকবর) দিকে যাচ্ছি। ছোট জেহাদ হল ধর্ম যুদ্ধ আর বড় জেহাদ হল আত্মশুদ্ধির জেহাদ। দুঃখের বিষয় আজ কাল মুসলমানেরা মহানবীর (সাঃ) নির্দেশকে উল্টিয়ে দিয়ে যুদ্ধের জেহাদকে জেহাদে আকবর এবং নফসের জেহাদকে জেহাদে আসগর বানিয়েছে। মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন ইয়াতি আলান নাসে জামানুন কামা আতা আলা বনি ইসরাইল। অর্থাৎ- এমন এক জামানা আসবে যখন মুসলমানেরা ইহুদীদের রীতি নীতি গ্রহণ করবে। হুবহু ইহুদীদের মত হয়ে যাবে স্বভাব চরিত্রে। আজ মুসলমানেরা তাই হয়েছে। ক্ষমা প্রেম প্রীতি বির্সজন দিয়ে তারা ইহুদীদের মত

নিষ্ঠুর হয়ে গেছে। কথায় কথায় তারা বোমা মারে অস্ত্রধরে। নিরপরাধ মানুষকে হত্যা করে নারী শিশু এবং বৃদ্ধদেরকে নির্মমভাবে হত্যাকরে, আজ ওলামারা নিজেদের নামের শেষে জেহাদী লকব লাগায়। আসলে এরা জেহাদী নয় ফাসাদী। আল কায়দা, তালেবান, জামাতে মুজাহিদিন হরকতুল জেহাদ, লস্করে তৈয়েবা ইত্যাদির নাম শুনলে অমুসলমান কেন মুসলমানদেরও ঘুম হারাম হয়ে যায়। এরা সুন্দরকে ধ্বংস করে। এরা মসজিদ, মন্দির এবং গীর্জায় প্রার্থনারত মানুষকে বোমামারে, হত্যা করে। পঙ্গুঁ করে দেয়। এদের কবল থেকে আজ কেউই নিরাপদ নয়। ইন্দোনেশীয়া থেকে আলজিরিয়া, আফ্রিকা থেকে পাকভারত উপমহাদেশের সাধারণ মুসমানরা পর্যন্ত এদের ভয়ে সদা ভীত। চব্বিশটি মুসলীমদেশকে আমেরিকা গুন্ডা রাষ্ট্র রুপে চিহ্নিত করেছে। ইউরোপ আমেরিকাবাসীর কাছে মুসলমান অর্থ হল নির্দয়, নিষ্ঠুর, খুনী, আত্মঘাতী বোমা হামলাকারী। তারা বলে কিতাবের ইসলাম আর মুসলমানের ইসলাম এক নয়। কাগজে ইসলাম অর্থ শান্তি হলেও মুসলমান মৌলবাদীরা শান্তির শত্রু মানবতার দুশমন। হায়! মেঘের আঁড়ালে যেমন সূর্য ঢাকা পড়ে তেমনি তথাকথিত মুসলমানের আঁড়ালে আজ পবিত্র ইসলাম ঢাকা পড়েছে। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইংরাজদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা সংগ্রামে অমুসলমানদের শ্লোগান ছিল ইনকেলাব জিন্দাবাদ আর ঢাল নাই তলোয়ার নাই মুসলমানদের শ্লোগান ছিল লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান। যুক্তি নয় প্রমান নয় শুধু জঙ্গ আর জঙ্গ। মহানবী (সাঃ) বলে গেছেন, এমন এক সময় আসবে যখন মুসলমানেরা ইসলাম নাম ব্যবহার করবে তবে তা প্রকৃত পক্ষে ইসলাম হবে না। তা হবে নামে মাত্র ইসলাম। তাদের কাছে কোরআন থাকবে তবে শিক্ষার উপর কোন আমল থাকবেনা, যদিও তারা কোরআন পড়বে খতমের উপর খতম দিবে। বড় বড় সুন্দর মসজিদ হবে কিন্তু তাতে প্রকৃত হেদায়েতের লোক পাওয়া যাবেনা। ঐ সব মসজিদ যেসব আলেমের দখলে থাকবে তারা শুধু ফেৎনা ফাসাদ করবে, ঐসব ফেৎনাবাজ ফতোয়াবাজ আলেম আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীব হবে। নিকৃষ্টতম জীব এজন্য যে অন্য কোন জীব এদের মত অনিষ্টকর হবেনা (মেশকাত শরিফে বর্ণিত হাদিসের ব্যাখ্যা) ঐসব ফেসাদী মোল্লারা শুকর ও বানরের স্বভাব প্রাপ্ত হবে (কানজুল উম্মাল) এই হাদিসে কথিত মোল্লাদেরকে কিছুটা সম্মান দেখিয়ে শুকর ও বানর বলা হয়েছে। পূর্ববর্তী হাদিসে শুকর ও বানর থেকে নিকৃষ্ট (আকাশের নীচে সকল জীবের চাইতে) বলা হয়েছে। কথাটি আমার ছোট মুখের নয় মহামানব সত্যনবী, মহানবী ও বিশ্বনবীর। মোল্লারা যদি একথার প্রতিবাদ করতে চায় তাহলে ইসলামের নবীর বিরুদ্ধে মিসিল বের করতে পারে। মহানবী (সাঃ) এও বলেছিলেন যে, ইসলামকে মুসলমানরা ৭৩ খন্ডে ভাগ করে ফেলবে। ৭২ দল হবে দোজখী শুধু একটি দল হবে জান্নাতি। ঐ দলটি

হবে মহানবীর দলের মত জামাত (মেশকাত) মহানবী (সাঃ) বলেছিলেন ধর্ম রক্ষার্থে যুদ্ধ করবে মালে গনীমতের জন্য নয়। কোন জাতিকে ধোকা দিবেনা। মৃতদের অপমান অসম্মান করবেনা। শিশু, স্ত্রীলোক, বৃদ্ধদেরকে হত্যা করবেনা। ইবাদত গৃহে অবস্থিত ধর্মীয় লোকদেরকে আক্রমন করবেনা। মানুষের সঙ্গে এহসান করবে ও শান্তি স্থাপনের চেষ্টা করবে (মুসলিম- আবুদাউদ) পুরোহিত, পবিত্রস্থান, ফলদার বৃক্ষ এবং জনবসতি ধ্বংস করবেনা (মোয়োত্তা) এই সব নীতি মেনে কি আজকাল যুদ্ধ করা সম্ভব? বোমা নিক্ষিপ্ত হলে শিশু স্ত্রীলোক বৃদ্ধ পুরোহিত জনবসতি ফলদার বৃক্ষ ফসল ধর্মস্থান কি রক্ষা পাবে? না কখনও নয়। অতএব বোমা দিয়ে যুদ্ধ করা ইসলামী যুদ্ধ নয়। বোমার ব্যবহার নবীর সন্নাত অনুযায়ী নিষিদ্ধ। জেহাদী ফসাদী মোল্লারা মোল্লা ওমর এবং উসামার নেতৃত্বে যা করছে তা হারাম, জগতবাসীকে আমরা জানিয়ে দিতে চাই, আজকাল মৌলবাদীরা যা করছে তা ইসলাম নয়। তাদের কর্ম কান্ড মহানবীর আদর্শের খেলাফ।

আব্দুল গাফফার চৌধুরীর একটি লেখায় পড়েছিলাম এক তালেবান মোল্লা একজন মহিলাকে ধরে নিয়ে যায় বলাৎকার করার জন্য। মহিলাটি হাতে পায়ে ধরে কান্নাকাটি করতে থাকে তার ইজ্জত নষ্ট না করার জন্য। তালেবানটি তখন উত্তেজিত, কোন কথাই তার কানে যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত কিছুটা নিরাপদ থাকার জন্য মহিলাটি বলল, ঠিক আছে তবে কনডম ব্যবহার কর। মোল্লা তালেবান বলল, আস্তাগফিরুল্লাহ' আমি কি নাসারাদের পদ্ধতি গ্রহন করতে পারি? এই হল উগ্র মৌলবাদীদের ইসলাম প্রীতি। ইয়ে মুসলমান হ্যায় ? জিনহে দেখকে শরমায়ে ইয়াহুদ ? ইহুদীরাও এদেরকে দেখে লজ্জা পায়। কথাটি আমার নয় মৌলবাদীদের প্রিয় কবি ইকবালের। আজকালকার মুসলমানরা যদি প্রকৃত মুসলমান হত তাহলে বুশের হাতে নির্যাতিত হতনা। আল্লার সাহায্য অবশ্যই নেমে আসত। বুশের আবস্থা ফেরাউন ও নমরুদের মত হত। কথিত আছে হালাকু খান যখন বাগদাদ আক্রমন করে তখন এক ওলি আল্লার কাছে মুসলমানরা গিয়ে বলল, আমাদের হেফাজতের জন্য দোয়া করুন। ঐ ওলী বললেন, আমার কাছে ইলহাম হয়েছে- ইয়া আইউহাল কুফফারু উকতুলুল ফুজ্জার, হে কাফেরগণ, পাপীদেরকে হত্যা কর। যারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে তাদের সমন্ধে আল্লাতালা বলেন ঃ মান কাতালা নাফসান বিগায়রি' নাফসিন আও ফাসাদিন ফিল আরদে ফাকা আন্নামা কাতালান নাসা জামিয়ান (মায়েদা ৩৩ আয়াত) অর্থাৎ- কেহ কোন ব্যক্তিকে কোন ব্যক্তির হত্যার বদলা ব্যতিরেকে অথবা দেশে কলহ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির কারন ব্যতিরেকে হত্যা করলে সে যেন সমগ্র মানব মন্ডলীকে হত্যা করল। তারপর বলা হয়েছে, আর যে কেহ একটি জীবকে বাঁচাল সে যেন সমস্ত মানব মন্ডলীকে বাঁচাল। এই হল ইসলামের শিক্ষা। যারা বিনা কারনে নিরপরাধ মানুষকে বোমা মেরে হত্যা করে, প্রার্থনারত মানুষকে গুলি মারে তারা

মানবতার শত্রু, তারা বিশ্ব মানবের খুনী, মানব জাতির হত্যাকারী, তারা মুসলমানত নয়ই তারা মানুষ নামের অযোগ্য। এরা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতমজীব। আত্মঘাতি বোমা হামলা ইসলামে হারাম। কারন এই হামলার সঙ্গে আত্মহত্যা জড়িত। যারা আত্মহত্যাকরে তাদের জানাযা পড়া বৈধ নয়।

অমুসলিম চিন্তাবিদ ও নাদান দোস্তের কথা

মহানবীর (সাঃ) শিক্ষা হল, লা ইকরাহা ফিদ্দিন, ধর্মে বল প্রয়োগ নেই। ধর্ম প্রচারিত হবে আদর্শ এবং দলীল প্রমাণ দ্বারা, গায়ের বা অস্ত্রের বলে নয়। অমূসলমান চিন্তাবিদরাও তাই বলেছেন, 'বস্তুত তাহাদের সকল যুক্তিই পন্ড হইয়া যায়, যাহারা মনেকরে যে, জেহাদের উদ্দেশ্য ছিল তরবারির দ্বারা ইসলামের বিস্তার। কারণ ইহার বিরুদ্ধে সুরা হজে স্পষ্ট লিখিত আছে যে, জেহাদের উদ্দেশ্য মসজিদ, গীর্জা, ইহুদীদের উপাসনালয় ও সাধুসন্নাসীদের ভজনালয়কে ধ্বংস হইতে রক্ষাকরা (ডা.ডি.ডাবলিউ, লাইটস) মহাত্মা গান্ধী বলেছেন, 'আমি যতই এই বিস্ময়কর ধর্ম সম্বন্ধে গবেষণা করিতেছি, এই সত্য আমার কাছে ততই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে যে, ইসলামের প্রাধান্য তরবারির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয় যাই।' মোশীয় আওজিন ক্লোফল বলেছেন, 'মোহাম্মদ সমগ্র বিশ্ব জয়করিতে ও ইসলামের প্রাধান্য স্থাপন করিতে চাহিয়া ছিলেন কিন্তু অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর কোন প্রকার বল প্রয়োগ বা অত্যাচার করেণ নাই। তাহাদিগকে ধর্মমতের স্বাধীনতা দিয়াছেন। বিবেচনা শক্তির স্বাধীনতা দিয়েছেন।' প্রফেসার রামদেব বলেছেন, 'ইসলাম শুধু তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছে ইহা ভ্রান্ত কথা বস্ততঃ ইহা ঐতিহাসিক সত্য যে, ইসলাম প্রসারের জন্য কখনও তরবারি ধারণ করা হয় নাই। যদি ধর্ম তরবারির দ্বারা বিস্তার লাভ করিতে পারে, তাহা হইলে, আজ কেহ তাহা করিয়া দেখাইতে পারে।' পণ্ডিত জ্ঞানেন্দ্র দেব শর্মাশাস্ত্রী বলেন, 'বিরুদ্ধবাদীরা অন্ধ। তাহারা দেখিতে পায়না যে, মোহাম্মদের দয়া ও সৌজন্য বন্ধুত্ব ও ক্ষমাই ছিল তাঁহার তরবারী, যাহা বিরুদ্ধবাদী দিগকে সম্পূর্ন রুপে পরাভূত করিত। ইহা তাহাদের হৃদয়কে পরিস্কৃত করিয়া আয়নার ন্যায় উজ্জল করিয়া দিত। লৌহ নির্মত তরবারী অপেক্ষা ইহার ক্ষমতা ভংঙ্কর ও অত্যন্ত ধারালছিল।' সম্পাদক সৎউপদেশ বলেন, 'লোকে বলে ইসলাম তরবারী দ্বারা বিস্তার লাভ করিয়াছে। কিন্তু আমরা তাদের এই অভিমতের সহিত একমত হইতে পারিনা। কারণ বল পূর্বক যাহা বিস্তার লাভ করে শীঘ্রই অত্যাচারীর নিকট হইতে তাহা কাড়িয়া লওয়া হয়। ইসলামের প্রচার অত্যাচার মূলক হইয়া থাকিলে আজ ইসলামের নামগন্ধও থাকিতনা। কিন্তু ইহার পরিবর্তে আমরা দেখিতে পাই যে, ইসলাম দিন

দিনই উন্নতি করিতেছে কেন? এই জন্য যে, ইসলাম ধর্ম প্রবর্তকের মধ্যে আত্মাধিক শক্তি ছিল। মানুষ মাত্রের জন্যই তাঁহার প্রেম ছিল।'

জামাতে ইসলামী নামক রাজনৈতিক দলের প্রতিষ্ঠাতা মৌদুদী সাহেবের দাবী তিনি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছেন, সেই ইসলাম ওয়াজ নসিহতের ইসলাম নয় প্রেম প্রীতি ভালবাসার ইসলাম নয়। তার ইসলাম ফৌজদার বা সিপাহীদের ইসলাম। তার মীমাংশা তরবারীর দ্বারা হবে। তিনি বলেন, এক শতাব্দীর মধ্যে এক চতুর্থাংশ পৃথিবী মুসলমান হইয়া গেল, ইহার একমাত্র কারন ইসলামের তরবারী হৃদয়ের উপরিস্থিত সকল প্রকার আবরণ ছিন্ন ভিন্ন করিয়াছিল (আল-জেহাদ ফিল ইসলাম-১৩৮ পৃঃ) মৌদুদী বলেন, যেখানে মুসলিমপার্টি জন্ম গ্রহণ করে সেই দেশকেই (আরব) সর্ব প্রথম ইসলামী হুকুমতের অধীন করা হয়। ইহার পর রাসুলাল্লাহ পাশ্ববর্তী দেশ গুলিকে তাহার নীতির দিকে আহবান করেন। কিন্তু এই আহব্বানে সাড়া দেওয়া বা না দেওয়ার অপেক্ষা না করিয়া শক্তি সঞ্চয় করা মাত্র তিনি রোমক সম্রাটের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হন। এরপর আবু বকর পার্টির নেতা হইলে রোম, ইরান উভয় অইসলামী রাষ্ট্রকে আক্রমন করেন। ওমর এই অভিযানকে বিজয়ের শেষ সীমানায় পৌঁছান (হাকিকতে জেহাদ ৬৫ পৃঃ) তিনি বলেন, আপনারা উহাদিগকে শুধু উপদেশ দ্বারা মুনাফা খুরী হইতে নিবৃত্ত করিতে ইচ্ছা করিলে ইহা কোন ক্রমেই সম্ভব পর হইবে না। অবশ্যই ক্ষমতা দখল করিয়া আপনারা বল পূর্বক তাহাদের সব দুষ্টামীর অবসান করিতে পারেন (হাকিকতে জেহাদ, ১০ পৃঃ) তিনি বলেন, যে কেহ প্রকৃত খোদার জমিনে ফিৎনা ফাসাদ লোপ করিতে চায় এবং সত্যি আগ্রহ করেযে খোদার সৃষ্টির সংশোধন হউক, তাহার পক্ষে শুধু ওয়াজ নসিহতে কাজ করা বৃথা। তাহাদেকে দন্ডায়মান হইতে হইবে এবং ভ্রান্ত লোকদিগকে ক্ষমতাচ্যুত করিয়া শুদ্ধনীতির শাসন কায়েম করিতে হইবে (হাকিকতে জেহাদ ১১ পৃঃ) মৌদুদী আরো বলেন, সম্মুখে অগ্রসর হও, লড়াই করে খোদাদ্রোহীদেকে ক্ষমতাচ্যুত কর। (খুতবাত, ২০৫ পৃঃ) তিনি বলেন, জামাতে ইসলামী খোদার সিপাহীদের জামাত। খোদার জন্য ক্ষমতা দখল ব্যতিরেকে আর কোন উপায় নেই (হাকিকতে জেহাদ ৫৭ পৃঃ) মৌদুদীদের মতে তরবারীই হল আসল হাতিয়ার, যার দ্বারা ইসলামের আহবায়ক ওয়াজ নসিহতের মাধ্যমে ব্যর্থতার (নাউজুবিল্লাহ) পর সফলতা লাভ করেন (জিহাদ ফিল ইসলাম ৩৭ পৃঃ) মৌদুদীর শিষ্য গোলাম আজম বলেন, নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা দখল করতে না পারলে আফগানিস্তান ষ্টাইলে ক্ষমতা দখল করা যায় (ষ্টাডিসার্কেল) অর্থাৎ- তালেবানী পদ্ধতিতে ক্ষমতা দখল করতে হবে। বাংলাদেশে তাই শুরু হয়েছে আলকায়দা এবং তালেবানী কায়দায় গুপ্ত বোমা হামলা। বোমার ভয়ে সমগ্র বাংলাদেশ আজ ভীত সন্ত্রস্ত। হাটে বোমা, ঘাটে বোমা, বোমা মসজিদে, বোমা গীর্জায়, বোমা বিবাহের ভোজে ওলীমায়।

একটি ভবিষ্যৎ বাণী

কোরআনে প্রথম অবতীর্ণ বানী (ইকরা এবং আল্লামা বিল কালাম) অর্থাৎ- পড় তোমার প্রভূর নামে এবং কলমের মাধ্যমে প্রচারিত জ্ঞান অনুসন্ধান কর। অজানাকে জান। এই লেখা পড়ার বিষয়টি কোরআনের প্রথম বাণী। নামাজের কথা নয়, রোজার কথা নয়, যুদ্ধ জেহাদের কথা নয়, শরীয়তের অন্য বিধান নয়। প্রথম হুকুম হল, পড় এবং কলমের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন কর।

মহনবী (সাঃ) পড়তে এবং লিখতে জানতেন না। জীবনে কখনো কলম দিয়ে কিছু লিখেননি। অথচ তাঁকে প্রথমেই বলা হয়েছে পড়তে এবং কলমের মাধ্যমে জ্ঞানার্জন করতে। সাহাবীরাও ভাল লেখা পড়া জানতেন না। নবী এবং অনুসারী সবাই ছিলেন উম্মি। বিদ্যা শিক্ষা ইসলামে ফরজ তাই বলে নবীর যুগে কেউই তেমন লেখা পড়ার সুযোগ পাননি। তখন কোন স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এমনকি মাদ্রাসা ও ছিলনা। ঐ যুগটি ছিল উম্মির যুগ। সুরা জুমআয় একটি নতুন যুগের ভবিষ্যৎবানী ছিল আখারিনদের যুগ। ঐ যুগে মহানবীর (সাঃ) এক বুরুজের আর্বিভাবের কথা, ওয়া আখারিনা মিনহুম লাম্মা ইয়াল হাকু বিহিম। ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, এমন এক যুগ আসবে যখন প্রকৃত ইসলাম থাকবে না কোরআন থাকবে তবে তার শিক্ষার উপর কেহ আমল করবে না। মসজিদ গুলি সুন্দর ইমারত হবে তবে তাতে প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা থাকবে না। আলেম সম্প্রদায় শুধু ফেৎনা সৃষ্টি করবে। ফতুয়াবাজী করবে, হানাহানী মারামারী করবে। যুক্তিকে বিসর্জন দিয়ে তারা অস্ত্রধারান করবে। তখন আল্লাহ তালা ইসলামের শিক্ষাকে জগতে পূনঃ স্থাপন করার জন্য এই উম্মতের মধ্য থেকে এক ব্যক্তিকে হেদায়াত সহ প্রেরণ করবেন। তিনি মহানবীর (সাঃ) অনুসরন অনুকরনে ইসলাম প্রচার করবেন। তখন আবার জগতে মহানবীর স্বর্ণ যুগ ফিরে আসবে। ঐ প্রতিশ্রুত সংস্কারককে বলা হবে মাহদী (হেদায়েত প্রাপ্ত) ইমাম মাহদী বা হেদায়েত প্রাপ্তদের নেতা। তিনি হবেন উম্মতে মোহাম্মাদীয়ার মসিহ (বোখারী, মেশকাত, আহমদ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য)। ইমাম মাহদী যখন আসবেন তখন তিনি বহু কাজ করবেন তম্মধ্যে একটি কাজ হবে যুদ্ধ রহিত করা। তিনি অস্ত্রের যুদ্ধ নিষিদ্ধ ঘোষনা করবেন। ইয়াজাউল হারবা। ইমাম মাহদী তো শরীতধারী নবী নন তিনি কি করে যুদ্ধকে হারাম ঘোষনা করবেন ? যুদ্ধকে তিনি নিষিদ্ধ ঘোষনা করতে পারেন না। নিষিদ্ধ ঘোষনা করেছেন শরীয়তধারী মহানবীই। তবে তা কার্যকর হবে তাঁর বিকাশ ইমাম মাহদীর (আঃ) যুগে। ইমাম মাহদী অস্ত্র দিয়ে নয় কলম দিয়ে জেহাদ করবেন। তাই তাঁর খেতাব হবে সুলতানুল কলম বা কলম সম্রাট। অসির কাজ তিনি মসিতে করবেন। তিনি ইসলামের সমর্থনে বিরুদ্ধবাদীদের সকল অবিযোগ খন্ডন করে তিনি পুস্তক লিখবেন। এই সেই কলম যার কথা পবিত্র কোরআনে বর্নিত হয়েছে। মাহদীর

যুগ লেখা পড়ার যুগ। ইমাম মাহদী (আঃ) বলবেন, আমি যুগের প্রতিশ্রুত পুরুষ। তোমরা যুদ্ধের ধারণা এখন ছেড়ে দাও। হাদিসে পড়নি তুমি ইয়াজাউল হারব ? যুদ্ধ বন্ধ হবে ইমাম মাহদী আসবেন যবে। অস্ত্রের কাজ তোমরা কলমে কর। বোমা বন্দুক ছেড়ে দাও, তোমরা হাতে কলম ধর। আহমদীদের দাবী ইমাম মাহদী হলেন আহমদী জামাতের প্রতিষ্ঠাতা। তিনি কলমের মাধ্যমে বহু পুস্তক রচনা করে ইসলামের প্রকৃত শিক্ষাকে সমগ্র জগতে প্রচার করেছেন। যার ফলে কোটি কোটি মানুষ ইসলামের পতাকা তলে সমবেত হয়েছেন। তিনি বলেছেন, যদি কোন হিন্দুর ঘরে আগুন লাগে আর সাধ্য থাকা সত্বেও যদি কেউ সেই আগুন নির্বাপিত না করে তাহলে জেনে রাখ, সে আমার সম্প্রদায় ভূক্ত নয়। যদি কোন খ্রীষ্টানকে কেউ হত্যা করতে চায় আর সামর্থ থাকা সত্বেও যদি তাকে রক্ষা না করে তাহলে সেও আমার অনুসারী নয়" (রুহানী খাজায়েন)। তিনি বলেছেন-

গলিয়া সুনকর দোয়া দেও

পাকে দুখ আরাম দেও।

গালি শুনেও দোয়া কর কল্যাণ কামনা কর, দুঃখ পেয়েও সেবা কর শান্তি দাও।

আও লুগো ছুড়দো জেহাদ কা খেয়াল দ্বীনকে লিয়ে হারাম হ্যায় জঙ্গও কিতাল।

জোছুড়তা হ্যায় নবীকি হাদিসকো তুম ছুড়দো উসখবিস কো।

যুদ্ধের নামে জেহাদের ধারনা তুমি ছেড়ে দাও। যারা নবীর হাদিস ইয়া জাউল হারবকে ছেড়ে দেয় তুমি সেই খবিসকে ছেড়ে দাও।

'সকল সঠিক মুসলমান যারা জগত থেকে গত হয়েছেন কখনও তাদের এই আকিদা ছিলনা যে ইসলামকে তরবারি দ্বারা প্রসারিত করা হোক, বরং সব সময় ইসলাম নিজস্ব সৌন্দর্যের কারণে পৃথিবীতে প্রসারিত হয়েছে (তরইয়াকুল কুলুব)।

'কোরানে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে যে, ধর্ম প্রসারের জন্য তলোয়ার উঠাবেনা এবং ধর্মের নিজস্ব সৌন্দর্যগুলি উপস্থাপন কর এবং আদর্শের দ্বারা নিজের দিকে আকর্ষণ কর' (সিতারায়ে কায় সারিয়া)।

'মসিহে মউদ দুনিয়ায় এসেছেন যাতে ধর্মের নামে অস্ত্র ধারণের ধারনাকে দূর করেন' (মলফুজাত-৩)

'অতঃপর কোন খুনী মাহদী বা খুনী মসিহের অপেক্ষা করা সরাসরি অহতুক (মসিহ হিন্দুস্তানমে)। স্মরণ রেখ, জেহাদকে যেভাবে মুসলমান উলামা যাদের মৌলবী বলা হয়, বুঝেছেন, আর যেভাবে সাধারণের কাছে জেহাদের প্রয়োজনীয়তার কথা বর্ণণা করেন কখনও তা সঠিক নয়' (ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ও জেহাদ)।

'এখন তরবারির জেহাদের সমাপ্তি কিন্তু নিজের নফসের পবিত্রতার জেহাদ অবশিষ্ট আছে (ইংরাজ গভর্ণমেন্ট ও জেহাদ)।

লেখকের কামনা

মহানবী বলেগছেন, যুদ্ধ রহিত হবে
ইমাম মাহদী মসিহ্ আসিবেন যবে।
অস্ত্র নয় হাতে নাও কলম লেখনি,
দেহ নয় মনের উপর আঘাত হান এখনি
দূর হয়ে যাক যত কালিমা অসুন্দর,
শুদ্ধ হোক দুষিত সব হৃদয় অন্তর।
বোমা বাজি বন্ধ হোক, হোক বন্ধ তালেবানী,
বুশতন্ত্র ধ্বংস হোক, হোক ধ্বংস লাদেনী।
সমগ্র ধরনী হোক নন্দন কানন সম
ভুমিতে স্বর্গ হোক এই কামনা মম।
যুদ্ধ এক অভিশাপ রক্ত ধ্বংস ক্রন্দন,
থেমে যায় গতি ধারা জগতের স্পন্দন।
হাদিসে স্পষ্ট আছে ইজাউল হারব,
অস্ত্র দিয়ে নয়, হত্যা নয়, রব-
উঠিবে সারা বিশ্বে শান্তির বাণী,
ঢাকা থেকে শুরু করে মার্কিন রাজধানী।
প্রকম্পিত হবে মানুষের হুঁকারে.
জাগ্রত হবে বিবেক পাষন্ড মাঝারে।
ঔম শান্তি, শলোম, আসসালাম
মীর, পিস ধ্বনি দিবে মানুষ তামাম,
আমাদের কামনা আসুক সেই দিন,
হে প্রভূ, দয়াময় আমীন আমীন।।

আমার লেখা লেখি

আমার প্রথম লেখা প্রকাশিত হয় পঞ্চাশের দশকের শুরুতে। তারপর ১৯৬০ থেকে ২০০৩ পর্যন্ত শতাধিক পুস্তক এবং অসংখ্যা প্রবন্ধ ও কিছু কবিতা, প্রকাশিত হয়। এই লেখনির মাধ্যমে বহু জ্ঞানী গুনী মানুষের সঙ্গে আমার সম্পর্ক গড়ে উঠে। অন্য কোন কারণে নয় একমাত্র আমার লেখনির কারনে বহু সুহৃদ আমি পেয়েছি। আমি বহু পদে কাজ করেছি। সর্বোচ্চ ন্যাশনাল পদে আসীন হয়েছি। অথচ ঐ সব আমার পরিচয় নয়। আমার পরিচয় আমি একজন কলম সৈনিক। আমার পাঠক বন্ধুদের কাছ থেকে লক্ষাধিক টাকা পেয়েছি, ফলে তা প্রকাশনার কাজে সহায়ক হয়েছে, সম্প্রতি এক বিপদে পড়েছিলাম, কোন সাহায্যকারী নেই, তখন আমার এক পাঠক যিনি সরকারের উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা তিনি এগিয়ে আসেন সাহায্যের জন্য। সাহস দিলেন, সাহায্য করলেন। আমি সুলতানুল কলমের শিষ্য। ইকরা এবং কলম আমার অস্ত্র। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমার ছেলে আমার কলমের সাধনা পছন্দ করে না। আপসোস! দেশ বিদেশে আমার বই সমাদ্রিত হয়েছে। আমার লেখার অগনিত ভক্ত রয়েছে দেশে বিদেশে। সত্য মাত্রই তিক্ত। আল হাক্কু মার্রুন। তাই বলে কি সত্য বলা ছেড়ে দিতে হবে? কবির কথায় বলি-

বিধির বিধান মানতে গিয়ে
বিশ্ব যদি কয় পাগল
নিষেধ যদি দেয় আগল
মাথার উপর আছেন সত্য
বেপরোয়া তুই সত্য বল।

বিঃ দ্রঃ এই বইটি প্রকাশে সাহায্য করেছেন ইঞ্জিনিয়ার এম, এ, রহমান।

গ্রন্থ আলোচনা

আমার কথা। আহমদ তৌফিক চৌধুরী। ঋতুপত্র প্রকাশনী, আদাবর, ঢাকা। প্রকাশকাল ঃ ২২ মার্চ, ২০০৩। পৃষ্ঠা ঃ ৭২। মূল্য ১০০ টাকা।

জনাব আহমদ তৌফিক চৌধুরী রচিত আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ 'আমার কথা' আদ্যোপান্ত গভীর মন দিয়ে অধ্যয়ন করলাম। বইটি অধ্যয়নের পর থেকেই এর ওপরে একটি নাতিদীর্ঘ লিখিত আলোচনা উপস্থাপনের জোর তাগিদ অনুভব করছিলাম। কেননা বার বারই আমার মনে হয়েছে গ্রন্থটির পরতে পরতে মানব জনমের পরম বাস্তবতার এমন এক নিখুঁত ও অনবদ্য চিত্রায়ন ঘটেছে যা অনাগত প্রজন্মের জন্য পাথেয় হতে পারে।

লেখকের জন্ম ১৯৩২ খ্রিষ্টাব্দে, সেলবরস এর এক বিশিষ্ট মুসলিম জমিদার পরিবারে। পিতা গোলাম জিলানী চৌধুরী জমিদার হয়েও ছিলেন অতি সহজ-সরল জীবনের অধিকারী। মাত্র ১০ বছরের দুরন্ত কৈশোরে লেখক তাঁর স্নেহময়ী মাকে হারান। ঘরে আসেন বিমাতা। একদিকে আকস্মিক মাতৃবিয়োগ, অন্যদিকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ডামাডোল, এ দুয়ের প্রভাবে লেখকের জীবন অনেকটাই যেন এলোমেলো হয়ে যায়। অন্ততঃ ৪ বার তাঁকে স্কুল পাল্টাতে হয়। শেষটায় ঠাঁই হয় ময়মনসিংহ শহরে ১৯৪৯ সালে।

লেখকের জীবনের সবচে তাৎপর্যময় অধ্যায় হলো তাঁর আধ্যাত্মিক জীবন। আধ্যাত্মিক জীবনে উত্তরণের পথ-পরিক্রমায় নির্মম ট্র্যাজেডী' তাঁর সমগ্র জীবনে নতুন মাত্রা আনে। তাঁকে দেয় নতুন অবয়ব। জন্মগতভাবে লেখক একজন সুন্নী মুসলমান হলেও ময়মনসিংহে আসার পর তাঁর পরিচয় ঘটে ইসলাম থেকে খ্রিষ্ট ধর্মে ধর্মান্তরিত কতিপয় খ্রিষ্টানের সাথে। বিষয়টি তাঁকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তুলে। তাদের সাথে সূক্ষ্ম ও সুদীর্ঘ ধর্মীয় সংলাপের সূত্র ধরেই অবশেষে একদিন তিনি সন্ধান পেলেন আহমদী জামাতের। ১৯৫৭ সালে লেখক সস্ত্রীক আহমদী জামাতে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রবেশ করেন। অন্যদিকে এ জামাতে যোগদানের পর থেকেই তাঁর ওপর নেমে আসে দুর্যোগের ঘোর অমানিশা। ধর্মীয় মতদ্বৈততার অভিযোগে তাঁকে বিতাড়িত হতে হলো পিতার সংসার থেকে, বের হয়ে আসতে হলো শ্বশুরালয় থেকে, এমন কি শেষটায় ঠাঁই হলোনা ভগ্নিপতির বাড়িতেও।

শুরু হলো সত্যের পথে অবিচল পথিকের নিঃসঙ্গ পথ চলা। সংশয়মুক্ত ধর্মীয় স্বাতন্ত্র্য একদিকে লেখককে দিল পরম প্রশান্তি অন্যদিকে নেমে এলো ঘাত-প্রতিঘাতের সীমাহীন চড়াই-উৎরাই। আত্মমর্যাদাপূর্ণ ও গ্লানিমুক্ত জীবন ও জীবিকার তাগিদে লেখককে অসংখ্যবার অগ্নি পরীক্ষা দিতে হয়েছে- দাঁড়াতে হয়েছে আদালতের কাঠগড়ায়। বার বারই তাঁর মেহেরবান মাবুদ তাঁকে হেফাযত করেছেন সম্মানিত করেছেন, বিজয়ী করেছেন।

'আমার কথা' শীর্ষক পুস্তকে ১ থেকে ৩৯ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক 'ছোট বেলার কথা' 'আমার পিতা-মাতার কথা', 'বিশ্বযুদ্ধ ও স্বাধীনতা', 'আহমদী জামাতে', 'সেলবরস', আল্লাই বান্দার জন্য যথেষ্ট', 'আসামীর কাঠগড়ায়' ইত্যাদি শিরোনামে উপরোল্লিখিত কথাগুলোই বিক্ষিপ্ত ভাবে পরিবেশন করতে প্রয়াসী হয়েছেন।

বইটির ৪০ থেকে ৫৮ পৃষ্ঠা পর্যন্ত 'আমি কাদিয়ানী নই' শিরোনামে লেখক প্রশ্নোত্তর আকারে আহমদী জামাত ও প্রসঙ্গ বিষয়াদি সম্পর্কে সাধারণ মানুষের নিত্য জিজ্ঞাসিত ৬৮টি সাধারণ প্রশ্নের অনুপম জবাব দিয়েছেন সাবলীল ভঙ্গিতে। লক্ষনীয়

যে, স্পষ্টভাষী ও যুক্তিবাদী লেখক প্রশ্নগুলোর জবাব দিতে গিয়ে কপটতা, চাতুর্য বা কূট কৌশল অবলম্বন করেন নি। সঙ্গত কারণেই আশা করা যায়, প্রশ্নোত্তরগুলো আহমদীদের সম্পর্কে অন্যদের অনেক ভ্রান্তি ও ভূল বুঝাবোজির অবসান ঘটাতে সক্ষম হবে। পুস্তকের ৫৮ পৃষ্ঠা থেকে ৬৬ পৃষ্ঠা পর্যন্ত লেখক 'আরো কথা' শিরোনামে প্রশ্নোত্তর আকারে আরও ২৭টি প্রশ্নের জবাব দিয়েছেন। এটিকে প্রশ্নের জবাব না বলে 'স্বপ্রনোদিত কৈফিয়ৎ প্রদান' বলাই হবে অধিকতর যুক্তিযুক্ত। এ অধ্যায়ের প্রশ্নগুলো লেখকের একান্ত নিজস্ব এবং তাঁর ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও ধর্মীয় নিরিখে প্রনীত। আহমদী মুসলিম জামাতের ন্যাশনাল আমীর হিসেবে দায়িত্ব পালনকালীন সময়ে এবং এর পূর্বাপর কালে অন্যান্য প্রসঙ্গে যারা তাঁর ব্যাপারে খড়্গহস্ত ছিলেন, তাঁকে বিষোধগ্‌ার করেছেন এমন কি তাঁকে নির্মূল করার ব্যাপারে সচেষ্ট থেকেছেন- লেখক নিজেই নিজের দিকে এক ঝাঁক প্রশ্নবাণ ছুঁড়ে দিয়ে আত্ম জবানীতে সেগুলোর ধারাবাহিক জবাব বিধৃত করেছেন এ অধ্যায়ে। কোন কোন জবাব কারো কারো কাছে সুখকর না হয়ে বিব্রতকর ও স্পর্শকাতর মনে হতে পারে। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাসের অখন্ডতার স্বার্থে, ঐতিহ্যের সুনিপুণ রূপায়নের আকাঙ্ক্ষায় একজন মহৎ ও দায়িত্বশীল লেখককে সেটি করা ছাড়া গত্যন্তর থাকে না। 'আমার কথা'র লেখক বিশুদ্ধ মেজাজে তাঁর সামাজিক দায়বদ্ধতাকে বিমূর্ত করেছেন খোলামেলা ভাবে, প্রজ্ঞামায় প্রশ্নোত্তরের প্রচ্ছায়ায়। মূলতঃ এভাবে তিনি সভ্যতা সংরক্ষণেরই পৃষ্ঠপোষকতা করেছেন।

বইটির ভাষা সুন্দর, প্রাঞ্জল, নির্ভুল ও সুখপাঠ্য। তবে লেখকের একাত্তর বছরের ঘটনাবহুল বর্ণাঢ্য জীবনালেখ্য নেহায়েত সংক্ষিপ্তকারে পরিবেশিত হয়েছে। সুষ্ঠুভাবে জীবনের বিষয় ও অধ্যায় প্রক্ষেপনও খানিকটা লজ্ঘিত হয়েছে। লেখকের প্রকাশিত গ্রন্থরাজির কোন তালিকাও তুলে ধরা হয় নি। এগুলো বইয়ের ঈষৎ দুর্বল দিক।

লেখক পুস্তকের ভূমিকায় বলেছেন, "বইটি কিন্তু আমার ব্যক্তিগত ডায়েরী। অতএব, এটিকে ঐ গন্ডির মধ্যে রেখেই বিচার করবেন। পাইকারী দৃষ্টিতে দেখবেন না।" লেখকের এ বিনীত আরজ বিবেচনায় রেখে যথাসম্ভব মুক্ত ও অনাবিল মন নিয়ে বিচার করলে এটিকে 'আকর গ্রন্থ' বলা যায়।

লেখকের দীর্ঘায়ূ ও বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

আরিফ ফয়সাল

এলএল.বি. (সম্মান).এলএল.এম.(ঢাকা)।

ঋতুপত্র প্রকাশনী (কাসপা)

মহারাজা রোড, ময়মনসিংহ।
আহমদ তৌফিক চৌধুরীর ৪০ বৎসরের গবেষণার ফসল।
সাহিত্যে অভূতপূর্ব সংযোজন।

১। একটি শাশ্বত ধর্মের সন্ধানে-
৬টি ধর্ম নিয়ে তুলনা মূলক আলোচনা।

২। সত্যের কষ্টি পাথরে ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও বিশ্বাস-

৩। বিবিধ বিচিত্রা
ধর্মের নামে এদেশে অনুষ্ঠিত কর্ম ও বিশ্বাসের আলোচনা।

৪। কালে কালে কাল গণনা কালেকালে নারী-
সন তারিখ বর্ষ ও নারী সমাজ সম্বন্ধে ইতিহাস, বিবরণ ও ঘটনা প্রবাহ।

৫। ইসলামী রাষ্ট্র বনাম ইসলামী খেলাফত-
ইসলামে চির স্থায়ী ব্যবস্থা একমাত্র খেলাফত, রাষ্ট্রনয়, রাজনীতি নয় তার ধর্মীয় দলীল প্রমান।

৬। বেদের নরাশংস-
নরাশংস বা নর কর্তৃক প্রশংসিত ব্যক্তি যে মোহাম্মদ (সাঃ) বিভিন্ন গ্রন্থথেকে তার প্রমান।

৭। দুনিয়ার এপিট ওপিট-
এশিয়া, ইউরোপ এবং আমেরিকার নানা স্থানে সফরের আকর্ষনীয় বর্ণনা।

৮। প্রতিশ্রুত ইমাম মাহ্দীর সন্ধানে-
ইমাম মাহ্দী সংক্রান্ত নানা মতের পর্যালোচনা।

৯। আল-কোরআনের প্রথম সুরা
সুরা ফাতেহার তফসির।

১০। মুসলিমের দৃষ্টিতে কৃষ্ণ
কৃষ্ণ ও হিন্দু ধর্মের আলোচনা।

১১। আমার কথা-
আত্মজীবনী।